তারিখ 12 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন

।। শহিদুল ইসলাম ।।

।। ২ ।।

বার ও তের শতকে চার্চ তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং সমগ্র ইউরোপের 'ইহলোক' ও 'পরলোক'-এর ভাগ্য-বিধাতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। কাজেই যাজক সম্প্রদায় সম্পর্কিত আইন ও গীর্জার অনুশাসন এবং ক্ষমতার স্বপক্ষে প্রচারণা চালানোর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাদ্রী তৈরীর উদ্দেশ্যে এগার ও বারো শতক থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। যে জেলার সীমানার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতো, সেই জেলার বিশপ হতেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তৃপক্ষ। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় গীর্জার ওপর নির্ভরশীল ছিল। গীর্জাও উদার হাতে প্রদান করতে কার্পণ্য করতো না। তদুপরি ছাত্রদের বেতন ও ফাইন এবং স্থানীয় বিত্তশালী সামন্ত অভিজাত শ্রেণীর দান-অনুদান থেকেও যথেষ্ট আয় হতো। এছাড়া প্রতিষ্ঠার প্রাক্কাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় রাজার আনুকূল্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। তাই প্রথম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গীর্জা ও রাজার মধ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা লাভের স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে উপায় ছিল না। আজ অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবতে ভালবাসেন। সত্যিকারের ইতিহাস জ্ঞান তাদেরকে বড়ই অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলবে। গীর্জা ইতিহাসের প্রখ্যাত পণ্ডিত ভিভিয়ান গ্রীন বলেছেন: 'Throughout history the University have been more or less closely connected with Politics.' তাই রাজা, চার্চ ও পার্লামেন্টের ক্ষমতার লড়াইয়ের সংগে একত্র করে দেখলে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি ভালভাবে বোঝা যায়।

তখনকার প্রভুত্বকামী সমাজে, যেখানে চার্চ ও রাজা জীবনের সকল ক্ষেত্রকে তাদের কব্জায় রাখতে চায়, সেখানে নিজের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হয়। তাই দেখা যায়, চার্চ ও রাজার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করার উপায় উদ্ভাবন করেছে এবং তাদের কাজ করার এই স্বাধীনতাটুকু বাইরের কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তার যাত্রাপথ বড় সহজ ও সরল ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আইনগত সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। আবার কখনও ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার দাপট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নেমে এসেছে।

অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি অত্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো এবং শিক্ষকদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। দু'বছর পর পর শিক্ষকদের ভোটে চ্যান্সেলর নির্বাচিত হতেন এবং স্থানীয় বিশপ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন Doctor of devinity অথবা Doctor of Canon Law চ্যান্সেলর নিযুক্ত হতেন। ১৫ শতকের শেষ পাদ থেকে অধ্যাপকদের পরিবর্তে বহিরাগত একজন বিশপ চ্যান্সেলরের পদে নিয়োগ পেতে থাকেন। যেহেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে দূরে অবস্থান করতেন, তার একজন প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করতেন। এই প্রতিনিধি পরে উপাচার্য হিসেবে পরিচিত হোন। প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের তেমন কোন প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ১৬ শতকে এসে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। রাজকীয় নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কলেজ প্রধানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উপাচার্য ও ৫ জন কলেজ প্রধান সমন্বয়ে গঠিত 'ক্যাপুট' নামক সংস্থার ওপর কেমব্রিজের প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। ১৫৭০ সালে রাণী এলিজাবেথ কেমব্রিজের জন্য একপ্রস্থ নতুন স্ট্যাটিউট প্রদান করেন। যার ফলে কলেজ প্রধানদের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাদের ক্ষমতা ও সম্মানের যথেষ্ট ক্ষতি হবে বলে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৬৩৬ সালে রাজা প্রথম চার্লসের আমলে অক্সফোর্ডে অনুরূপ প্রশাসনিক রদবদল শুরু হয়। চ্যান্সেলর আর্চবিশপ লড বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে কলেজ প্রধানদের নিয়ে 'হেবডোমাডাল' গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কলেজ প্রধানদের আধিপত্য স্থাপনের পিছনে সম্ভবতঃ এই কারণ ছিল যে, কলেজের ওপর রাজতন্ত্রের নিরংকুশ আধিপত্য ছিল এবং নিজের সুবিধামত ব্যবহার করা সহজতর ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ১৬০৪ সালে রাজা প্রথম জেমস কর্তৃক পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির জন্য দু'টি করে সংসদ সদস্য পদ সংরক্ষণের ঘোষণা। ১৮৭১ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯১৮ সালে বাকী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই বিশেষ অধিকার সম্প্রসারিত হয়। ৩৪৪ বছর এই অধিকার ভোগের পর ১৯৪৮ সালে পার্লামেন্ট তা রহিত করে। কেউ যদি ভাবেন যে, এই অধিকার কেড়ে নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্বিত হল তাহলে ভুল হবে। কারণ সে সামাজিক অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়কে এই বিশেষ অধিকার ও সম্মান দেয়া হয়েছিল তা কোন সুসংগত অধিকার নয়, ঠিক তেমনি ১৯৪৮ সালে যখন তা প্রত্যাহার করা হয় তখনও তা সংগত ছিল না। এইভাবে ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সমাজ প্রগতির সংগে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার স্বায়ত্তশাসন সংজ্ঞা পাল্টে যায়। বিশ শতকের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক অধিকার যত সম্প্রসারিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা যত সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন তত সুদূর হয়।

যাহোক, ১৬ ও ১৭ শতকের দু'টি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। এক, রেনেসাঁ রিফর্মেশনের শেষ পাদে যখন সামন্ততন্ত্রের মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়েছে এবং তার ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে প্রগতিশীল পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ বেমানান নয় কি? বিশেষ করে, সেই হস্তক্ষেপ যখন আসে নতুন প্রগতিশীল শক্তির প্রতিভূদের কাছ থেকে? দুই, একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ করা ও অপরদিকে সংসদে দু'টি আসন সংরক্ষণ করে তার সম্মান বৃদ্ধি করা পরস্পর-বিরোধী নয় কি?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেই তা খুঁজতে হবে। তা না হলে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত জন্ম নিতে পারে। ১৫৩২ সালে রাষ্ট্র ও চার্চ রাজার অধীনস্থ হয় এবং রোমের চার্চের সংগে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। গীর্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। শুরু হয় প্রবল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা হ্রাস পায়, অপরদিকে এ্যাংগলিকান চার্চ, রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে ক্ষমতার নতুন দ্বন্দ্ব শুরু হয়। নৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে ক্যাথলিক চার্চের ওপরে নির্ভরশীল বিশ্ববিদ্যালয় এক অসহায় অবস্থায় পড়ে। অন্তর্বর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় দারুণ অর্থ

৩-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক খবর

তারিখ 12 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রাতষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন

৬-এর পাতার পর

কষ্টে পড়ে। আমরা জানি, ইংল্যাণ্ডের রেনেসাঁ ও রিফর্মেশনে নেতৃত্ব প্রধানতঃ এই দুই পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসে। তবুও এটা মিথ্যে নয় যে, উক্ত আন্দোলন দু'টি ছিল সংখ্যালঘুর আন্দোলন। দেখা যায় স্রোত যখন সাময়িকভাবে উল্টো দিকে বইতে শুরু করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় তখন অতি আগ্রহের সংগে বিশপ গার্ডিমার ও কার্ডিনাল পোলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সংস্কারবাদীদের অনেকে পালিয়েছেন এবং অনেকে ধরা পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। এলিজাবেথের ক্ষমতারোহণের সংগে সংগে স্রোত পুনরায় 'রিফর্মেশনের' পক্ষে বইতে শুরু করে এবং সংস্কারবাদীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে শুরু করেন। রোমান ক্যাথলিক কলেজ প্রধানদের চাকরিচ্যুত করা হয় এবং কলেজের ওপর এলিজাবেথের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রক্ষণশীল, সংস্কার বিরোধীদের প্রভাব এখনও বেশী। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে চ্যান্সেলর নিয়োগ করতে ভরসা পান না, নতুন শক্তি সরাসরি চ্যান্সেলর নিয়োগের দায়িত্ব নিতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের বিষয়ে বিশ্বস্ত কলেজ প্রধানদের ওপর নির্ভর করতে হয়। ভুলে গেলে চলবে না, তখনকার প্রেক্ষিতে এ সবই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এর ভাল-মন্দের বিচার তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষিতেই করতে হবে।

সংসদীয় আসনের ব্যাপারে দেখা যায়, ১৫৬০ দশকে রাজনৈতিক স্রোত যখন সংস্কারবাদীদের অনুকূলে আসে, ঠিক তখনই কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড সংসদীয় আসনের জন্য আবেদন করতে শুরু করে। ১৫৬৬ সালে কেমব্রিজ এবং ১৫৭০ সালে অক্সফোর্ড-এর জন্য আবেদন করে। ১৫৭০ সালে রাণী এলিজাবেথ যখন কেমব্রিজের জন্য নতুন স্ট্যাটিউট প্রদান করেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয় আতংকিত হয়ে উঠে এবং এর প্রতিবাদ করে। সেই সংগে ১৫৭২ সালে পুনরায় তারা সংসদীয় আসনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এই যোগাযোগকে অনেকেই গুরুত্ব দেন।

১৬৫০ সাল থেকে পরবর্তী দু'শ' বছর অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের প্রশাসনিক রদবদল হয়নি। এই দু'শ' বছরকে গবেষকরা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুর্দিন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের সমাজে অনেক রকম ঘটনা ঘটে গেছে। ১৬৪০-এর গৃহযুদ্ধে, রাজতন্ত্রের পতন, কমনওয়েলথের উত্থান, রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান, ১৬৮৮ সালের বিপ্লব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ১৬৬০ সালের রাজতন্ত্রের পুনরুত্থানকে বলা যায় এ্যাংগলিকান রক্ষণশীলতার বিজয়। এই সময় থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কড়া ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে চরম নিপীড়ন শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত চার্চ ও রাজার বিরুদ্ধাচারণ না করা এবং তাদের প্রতি আনুগত্যের শপথ না নেয়ায় অক্সফোর্ডের ১৩ জন ও কেমব্রিজের ৬ জন কলেজ প্রধান এবং ৭৫ জন ফেলো চাকরি হারান। এমনি বহু শিক্ষক বিতাড়িত হয়ে নিজেদের প্রচেষ্টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেসব প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা এতই কমে যায় যে, বহু শিক্ষক ক্লাস নেয়াই বন্ধ করে দেন। তাই দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এ্যাংগলিকান চার্চের নিয়ন্ত্রণ তাদের ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের ক্ষতিসাধন করেছে।

এই দু'শ' বছর ইংল্যাণ্ডের চার্চ রক্ষণশীলতার সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত হয়। সব রকমের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সে। চার্চের শিক্ষা বিরোধী ধর্মীয় নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে অনেকগুলো বিপ্লবী ধর্মমতের জন্ম নেয়। যেমন Desim, Methodism, Tractarianism ইত্যাদি। এর ফলে সমাজে চার্চের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এদের অনুগামীদের সংখ্যা বাড়লেও এদের শক্তি এখনও অনেক কম। ১৭৬৮ সালে অক্সফোর্ড ৬ জন Methodist ছাত্রকে বহিষ্কার করে। কেননা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য ধর্মীয় টেস্টের অবলুপ্তি দাবী করছিল। ১৭৭২ সালে ৩৯ আর্টিকেলের প্রতি বিশ্বস্ততার আইনটি রদ করার একটি প্রস্তাব কেমব্রিজ সিনেটে মাত্র ৮ ভোটে পরাজিত হয়। একশ' বছর পর ১৮৭১ সালে পার্লামেন্ট এই আইনটি রহিত করে। দেখা যায়, ১৮ শতকের শেষ ভাগ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হতে থাকে। বৃটেনে উদারপন্থী, মানবতাবাদী, গণতন্ত্রী ও সেকুলার শক্তির প্রসার ঘটতে থাকে, যা, উনিশ শতকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিশ্চিত করে।

উনিশ শতকের অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ ছিল ইংল্যাণ্ডের চার্চের শক্ত ঘাঁটি। ভিন্নমতাবলম্বী ও উদার পন্থীদের সেখানে ঢোকার কোন উপায় ছিল না। বেশীর ভাগ কলেজেই প্রাচীন পন্থী, বিলাসী জীবন-যাপনের কেন্দ্র ও কোনরূপ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তন বিরোধী। শিক্ষিত পাদ্রী তৈরী করাই ছিল প্রধান কাজ। অথচ বাইরের সমাজ আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনায় অস্থির একটা গুণগত উল্লম্ফনের দিকে সমাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবোধের প্রসার ঘটছে। ১৮৩১ সালের প্রথম নির্বাচনী সংস্কারের পরবর্তী একশ' বছরে সংসদ উচ্চ শিখর থেকে নীচে সাধারণ মানুষের মাঝে নেমে আসে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করার দাবী ভেতরে-বাইরে জোরদার হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত গুণগত পরিবর্তনের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কারের দাবীও উঠতে থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনও সেদিকে লক্ষ্য নেই।

তাই ১৮৫০ সালে পার্লামেন্টে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রয়েল কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করা হয় তখন উভয় বিশ্ববিদ্যালয় তার তীব্র বিরোধিতা করে এবং বেশীর ভাগ কলেজ কমিশনের

কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ না পেলে দেখা যায়, তার সুপারিশমালার মূল কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতন্ত্রায়ন ও স্বায়ত্তশাসন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় কলেজ প্রধানদের ভূমিকা খর্ব করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুরুত্ব বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। উপাচার্যের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা রদ করা হয়।

যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে বৃটেনে উনিশ শতকে শিল্প বিপ্লব ঘটে, সেই একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উচ্চ শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি করে এবং নতুন নতুন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা যোগায়। ফলে একদিকে যেমন অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় অন্যদিকে তেমনি উঠতি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি জোরদার হবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই প্রথম সমাজ, রাষ্ট্র ও জনমানুষের সেবায় নিয়োজিত হবার সুযোগ উপস্থিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি আজ রাষ্ট্রের সর্বত্র যেমন রাষ্ট্র পরিচালনায়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনায়, কৃষি ও শিল্প কলকারখানায়, উৎপাদন বৃদ্ধিতে, বিচার বিভাগে, সাংবাদিকতায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণে ও সর্বোপরি শিক্ষকতায় নিয়োজিত থেকে দেশ ও জাতির সেবা করে চলেছে। আজ আর বিশ্ববিদ্যালয় কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বা কোন দলীয় প্রতিষ্ঠান নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রযাত্রা আজ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। তাই ১৯৭১ সালে ইউনেস্কো ঘোষণা দেয় যে, 'Education, a duty and responsibility of the state'. বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে, সে নিশ্চয়তা রাষ্ট্র বা জাতিকে দিতে হবে। কোন গোষ্ঠী বা দলের ক্ষুদ্র শ্রেণীস্বার্থ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কর্মপদ্ধতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় চরিত্র যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্যে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষাসহ শিক্ষার অর্থনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সমাজ পরিবর্তনের একটি পর্যায়ে এসে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে শিক্ষার ভার নিজ দায়িত্বে তুলে নিয়েছে। সেদিক থেকে ১৮৩৩ এবং ১৮৮৯ বছর দু'টিকে যুগান্তকারী বছর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ ১৮৩৩ সালে বৃটিশ সরকার প্রথম প্রাইমারী শিক্ষাখাতে ২০,০০০ পাউণ্ড এবং ১৮৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের জন্য বছরে ১৫,০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করেন। পরিমাণের দিক থেকে এই অর্থ সামান্য হলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অন্যত্র। এই বরাদ্দের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা নীতিগতভাবে স্বীকার করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো।

প্রথম, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তির চাপ বৃদ্ধি পায়। আরো নতুন নতুন বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এই সব চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান প্রতিবছর বাড়তে থাকে। ১৯৫২-৫৭ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্য যে কোন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানকে দেয় বরাদ্দের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১০০ গুণেরও বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় গুরুত্ব কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা তারই প্রমাণ।

আজ প্রতিটি দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আসে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। বাহ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত সরকারের হাত দিয়ে রাষ্ট্রের অন্যান্য খাতের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ মঞ্জুর হয়। তাই সরকারের সংগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেখা যায়, উভয় পক্ষই এই অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। সরকারের কাছ থেকে অর্থ নেবার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সব সময়ই সতর্কতার মনোভাব বজায় রাখে। তাদের আশংকার কারণ সরকারী অর্থের পশ্চাদে সরকারী হস্তক্ষেপের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। সে জন্যে লিয়াজোঁ কমিটি হিসেবে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিটি' গঠিত হয়, যেন সরকারের সংগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি কোন সংঘাত না হয়। বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিটি স্বায়ত্তশাসন রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়নি।

১৯৪৮ সালের পর থেকে কয়েক বছর সংসদের 'Committee of Pablic Accounts' এবং 'Select Committee of Estimates' বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কড়া 'অডিট' নিয়ন্ত্রণের দাবী করে কিন্তু সরকারী কোষাগার সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে এসেছে এই যুক্তিতে যে, (a) Every Government has rejected the idea the state should control academic policy; (b) Any such detailed scrutiny of accounts would weaken the Universities sense of responsibility; (c) Only academics are capable of deciding what expenditure is or is not nesessary for academic purpose etc.

দেখা যায়, বর্তমানে সরকারের সংগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের ভিন্নতা সত্ত্বেও সকল সভ্য দেশই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে যেখানে গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠেনি, সেখানে কাগজে-কলমে স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করা হলেও কার্যতঃ তার অস্তিত্ব নেই। আবার অনেক স্বৈরতান্ত্রিক সরকার লজ্জার মাথা খেয়ে কাগজে-কলমেও তা স্বীকার করেন না।

(চলবে)